বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন ও বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়ন

এগারো মাসেরও কম ব্যবধানে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের দুটি প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশের উন্নয়নের অর্জন কতটা নাজুক হয়ে পড়েছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত ‘পভার্টি অ্যান্ড ইকুইটি অ্যাসেসমেন্ট’ দেখিয়েছিল, ২০১০ সালে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৭ দশমিক ১ শতাংশ। ২০২২ সালে তা নেমে আসে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশে। কিন্তু গত ৬ অক্টোবরে প্রকাশিত ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট’ বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জাতীয় দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ২২ দশমিক ৫ শতাংশে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে তা ২২ দশমিক ৮ শতাংশে উঠতে পারে।

নতুন প্রতিবেদনের আরেকটি হিসাব হলো, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরো প্রায় ২১ লাখ মানুষ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। দৈনিক ৩ ডলারের এই সীমা জাতীয় দারিদ্র্যের হার থেকে আলাদা মাপকাঠি। দুটি সূচকই বলছে, পরিবারগুলোর জীবনমান খারাপ হচ্ছে। তবে কোনোটিই নতুন খানা জরিপের গণনা নয়, দুটিই প্রাক্কলন। সরকারের মূল্যায়নে এ পার্থক্য মনে রাখা জরুরি।

মূল প্রশ্ন হলো, উৎপাদনশীল ব্যবসা আর তার ওপর নির্ভরশীল জীবিকা নষ্ট না করে বাংলাদেশ কি জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারে? দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই আর কর্মসংস্থান রক্ষা একে অপরের বিরোধী নয়। দুটিই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাজনৈতিক প্রতিশোধের কারণে যখন কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা বৈধ ব্যবসা বাধা পায়, তখন তার দাম দেন শ্রমিকেরা। অথচ কোনো আদালত তাদের এই শাস্তি দেননি।

ন্যায্য মূল্যায়নের জন্য মানতে হবে, সংকটের শুরু ২০২৪ সালের আগস্টে নয়। মূল্যস্ফীতি, ডলারের সংকট আর আমদানি নিয়ন্ত্রণ আগেই অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ব্যাংক খাতের দুর্বলতা জমেছে বহু বছর ধরে। কারণ দুর্বল তদারকি, যোগসাজশের ঋণ আর সুশাসনের ঘাটতি। দারিদ্র্য মূল্যায়ন প্রতিবেদনেও দেখিয়েছে, ২০১৬ সালের পর থেকেই প্রবৃদ্ধির সুফল আগের মতো সবার কাছে পৌঁছাচ্ছিল না। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক জ্বালানিসংকট এই চাপ আরো বাড়িয়েছে। এসব পুরোনো ও বাইরের সমস্যার পুরো দায় রাজনৈতিক পালাবদলের ঘাড়ে চাপানো যায় না।

তবে সমস্যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বলেই সরকার দায়মুক্ত, এমন নয়। প্রশ্ন হলো, সরকারের পদক্ষেপ পুরোনো দুর্বলতাকে সামাল দিয়েছে, নাকি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে? বিশ্বব্যাংক পুনরুদ্ধারের পথে চারটি বাধা চিহ্নিত করেছে: আর্থিক খাতের ভঙ্গুরতা, জ্বালানির সীমাবদ্ধতা, দুর্বল রাজস্ব আদায় এবং অনিশ্চয়তা। এমন পরিস্থিতিতে বৈধ ব্যবসা রক্ষা করা আর আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা কার্যকর জবাবের অপরিহার্য অংশ।

প্রবৃদ্ধি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। পরের তিন বছরে তা নামে যথাক্রমে ৪ দশমিক ২, ৩ দশমিক ৫ এবং আনুমানিক ৩ দশমিক ৪ শতাংশে। অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগেই প্রবৃদ্ধি কমতে শুরু করেছিল। আবার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শেষ অংশে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির থেকে, দায়িত্বে ছিল নির্বাচিত সরকার। তাই পুরো বছরের ফলাফলের দায় কোনো একটি সরকারের ওপর চাপালে সংশয়ের হিসাব ভুল হবে।

তবু ২০২৪ সালের আগস্টের পর শিল্পকারখানা ধ্বংসের ঘটনাগুলো সরাসরি খারিজ দেখা দরকার। ঋণগ্রস্ত চালু একটি কারখানা পুড়ে ছাই হয়েছে এবং তার শ্রমিকেরা কাজ হারিয়েছেন, উদ্বেগের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। ২০২৫ সালের ৫ মার্চ একটি জাতীয়

পত্রিকার প্রতিবেদনে দেখা যায়, আগের সাত মাসে প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোতে ৯৫টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৬১ হাজার ৮৮১ জন শ্রমিক। কারণ শুধু রাজনৈতিক সহিংসতা নয়। আর্থিক সংকট, ক্রেতাদের ঘাটতি, রাজনৈতিকভাবে যুক্ত ব্যবসায় হামলা এবং মালিকদের আত্মগোপন, সবকিছুই এর পেছনে কাজ করেছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, একটি মাত্র শিল্পপার্কের ১৪টি কারখানায় কাজ হারিয়েছেন ৩৩ হাজার ২৪৪ জন। এসব তথ্য প্রমাণ করে, শিল্পকারখানা রক্ষায় ঘাটতি ছিল এবং শিল্পে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে।

কোনো মালিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে তদন্ত হবে। যৌক্তিক হলে সম্পদ উদ্ধার হবে। ন্যায়বিচার হবে। কিন্তু সেজন্য কর্মী, সরবরাহকারী আর ক্রেতারা জীবিকা বা চুক্তি হারাবেন কেন? আইনের সুযোগ থাকলে এবং ব্যবসায়িকভাবে সম্ভব হলে পেশাদার প্রশাসক নিয়োগ বা পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি টেকসই প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখা যায়। এর মধ্যে আদালত দায় নির্ধারণের কাজ চালিয়ে যাবে। তবে পাওনাদারদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, যাতে সম্পদ লুকানো বা সরানো না যায়।

আবার কর্মসংস্থান রক্ষার অজুহাতে ঋণে ডুবে থাকা সব শিল্পগোষ্ঠীকে জনগণের টাকায় উদ্ধার করাও ঠিক নয়। কিছু ব্যবসা হয়তো আসলেই দেউলিয়া। কিছু টিকে ছিল এমন সুবিধার ওপর, যা আর চলতে পারে না। লক্ষ্য হওয়া উচিত সুশৃঙ্খল পুনর্গঠন, স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত এবং শ্রমিকদের আইনগত পাওনা পরিশোধ। রাজনৈতিক পরিচয় যেন দায়মুক্তির ঢাল না হয়। আবার তা যেন প্রণোদনের বিকল্পও না হয়ে ওঠে।

এজন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ধরে আলাদা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সন্দেহজনক অর্থ আর বৈধ কাজ চালানোর অর্থকে আলাদা করতে হবে। যে কোনো বিনিয়োগ হতে হবে যুক্তিসংগত, পরিমিত এবং পুনর্বিবেচনাযোগ্য। শ্রমিকেরা মজুরি ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে পরিষ্কার তথ্য

পাবেন। ঋণদাতারা পাবেন নির্ভরযোগ্য হিসাব ও টেকসইতার মূল্যায়ন। এই শৃঙ্খলা না থাকলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযানেই পুরো সরবরাহব্যবস্থায় ক্ষতি ছড়ায় এবং বৈধ আইনি পদক্ষেপের ওপর আস্থা কমায়।

অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ে চেনা পথে। কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। আইনি অনিশ্চয়তায় ব্যাংক ঋণ দিতে আর উদ্যোক্তা বিনিয়োগ করতে দ্বিধা করেন। শ্রমিক মজুরি হারালে কেনাকাটা কমে, তার ধাক্কা লাগে আশপাশের দোকান আর পরিবহনে। তবে বিশ্বব্যাংকের সামগ্রিক পরিসংখ্যানে রাজনৈতিক প্রতিশোধের আলাদা প্রভাব কতটা, তা মাপা হয়নি।

বিনিয়োগের সূচকগুলো উদ্বেগজনক। ২০২৬ সালের জুনে বেসরকারি খাতে ঋণবৃদ্ধি নেমে আসে ৪ দশমিক ৫ শতাংশে। খবরে বলা হয়েছে, এটি ৩৩ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নিট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ১৫ শতাংশ। নতুন ইকুইটি বা শেয়ারভিত্তিক বিনিয়োগ কমেছে ৭০ দশমিক ৩ শতাংশ। আর্থিক খাতের দুর্বলতা, জ্বালানির ঘাটতি আর বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও এতে ভূমিকা আছে। তাই এসব সংখ্যা একক রাজনৈতিক কারণের প্রমাণ নয়, বরং কঠিন বিনিয়োগ পরিবেশের সতর্কসংকেত।

আগের দারিদ্র্য মূল্যায়নে দেখা গিয়েছিল, ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে কর্মরত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ কমেছে। ২০২৫ সালে আরো ৮ লাখ কমতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছিল। এটি যাচাই হওয়া ফল নয়, তবে মূল বার্তাটি প্রাসঙ্গিক। কর্মসংস্থান আর ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকলে সবচেয়ে বিপদে পড়ে সেই পরিবারগুলো, যাদের ধাক্কা সামলানোর সামর্থ্য কম।

কিছু অর্জনও স্বীকার করতে হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রবাসী আয় দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৫৮০ কোটি ডলারে। রিজার্ভের অবস্থাও ভালো হয়েছে। গড় মূল্যস্ফীতি ১০

শতাংশ থেকে কমে ৮ দশমিক ৭ শতাংশে নেমেছে। এসব অর্জন দুই সরকারের সময় জুড়েই এসেছে। খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র সামনে আনাও দরকার ছিল। তবে ২০২৬ সালের জুনে খেলাপি ঋণের হার ৩৩ দশমিক ২ শতাংশ, যা বলে দেয় মেরামতের কাজ কত বাকি। সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা মূল্যবান। কিন্তু সেই স্থিতিশীলতাকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ আর কর্মসংস্থানে রূপ দিতে হবে।

পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব এখন নির্বাচিত সরকারের কাঁধে। টিকে থাকতে সক্ষম প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইনসম্মত পুনর্গঠনের মাধ্যমে রক্ষা করতে হবে। ব্যাংক পুনর্গঠনে দরকার বিশ্বাসযোগ্য সময়সীমা আর লোকসানের ন্যায্য বণ্টন। জ্বালানি সরবরাহ ও রাজস্ব আদায়ও বাড়াতে হবে। অতিদরিদ্রদের প্রায় অর্ধেক এখনো কোনো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় নেই। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, খাদ্য ভাউচারগুলো একত্র করে এবং ফ্যামিলি কার্ডের সঙ্গে নগদ সহায়তা কর্মসূচিগুলোকে আরো ভালোভাবে লক্ষ্যভিত্তিক করলে বাড়তি প্রায় সাড়ে ২৮ লাখ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনা সম্ভব। তবে এটি শর্তসাপেক্ষ প্রাক্কলন, নিশ্চয়তা নয়।

লেখক: ড. মোহাম্মদ এ রব যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী অর্থনীতিবিদ, নীতি বিশ্লেষক এবং আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্বাধীন পরামর্শক